INSPIRE

AL-MALAHEM MEDIA

“গুলির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাওয়া এক বার্তা”

ওয়াশিংটনের রাজধানীতে অবস্থিত ইহুদী ক্যাপিটাল মিউজিয়ামে হামলা নিয়ে ইনস্পায়ারের দিকনির্দেশনা

গ্রীষ্ম, ২০২৫ ইংরেজি | ১৪৪৬ হিজরি

ইন্সপায়ার গাইড

ওয়াশিংটনে—যেখানে বৈশ্বিক হত্যাযন্ত্র চালু রাখা হয়, যেখানে গণহত্যার নির্দেশনাগুলো আন্তর্জাতিক বৈধতার কালি দিয়ে লেখা হয়, আর মুসলমানদের খুলি যেখানে মানবাধিকার রিপোর্টে শুধু সংখ্যায় পরিণত হয়—সেখানে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটেছে। শিকাগো শহরের এক ৩১ বছর বয়সী আমেরিকান নাগরিক দুজন ইসরাঈলি কূটনীতিককে হত্যা করেন। হামলার কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি এক বিবৃতিতে জানান, তাঁর এই পদক্ষেপ ছিল গাজায় চলমান গণহত্যা এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইসরাঈল প্রীতির বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক প্রতিবাদ। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, ‘ইলিয়াস রদ্রিগেজ’ হামলার-সময় চিৎকার করে বলছিলেন: “ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা চাই… আমি এটা করেছি ফিলিস্তিনের জন্য… গাজার জন্য,” এবং সবাইকে ডাকছিলেন এই বলে: “ফিলিস্তিনের এখন একটি বিপ্লব দরকার।”



প্রত্যাশিতভাবেই হোয়াইট হাউজ দ্রুত এই ঘটনার নিন্দা করে। এটিকে 'ঘৃণ্য ঘৃণাজনিত অপরাধ' এবং 'একটি সন্ত্রাসী হামলা' বলে অভিহিত করে। মার্কিন রাজনীতিবিদরা এই ঘটনার নিন্দা করতে একে অপরকে টপকানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। তাদের অবস্থান এমন যেন গাজার শিশুদের রক্ত এমন কিছু নয়, এর জন্য অন্তত কিছু সম্মানজনক নীরবতা প্রাপ্য ছিল।

আর সেই কুখ্যাত কট্টরপন্থী ট্রাম্প, যে বহুবার ফিলিস্তিনে চলা গণহত্যাকে সমর্থন জানিয়েছিল, সেও এই ঘটনাকে ব্যবহার করে আবারও তার পুরানো স্লোগান ফিরিয়ে আনে—'উগ্রতা ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে লড়াই'।

এদিকে মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অঙ্গীকার করে, তারা যুক্তরাষ্ট্রে এখনো যতটুকু 'বিবেক' অবশিষ্ট আছে, সেটাকেও খুঁজে বের করে দমন করবে।

ইসরাঈলি দখলদার সরকার, তাদের তরফ থেকে শুধু একটি প্রথাগত শোকবার্তা দেয়।

তবে সেই বার্তাও তারা মিডিয়ায় এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন তারা চিরন্তন নির্যাতিত পক্ষ,

আর এই ঘটনাকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে নিজেদের নিরাপত্তা উপস্থিতি আরও জোরদার করার চেষ্টা চালায়।



পাশ্চাত্যের মূলধারার গণমাধ্যম, যারা বহুবারই 'ভিকটিম' আর 'নির্যাতনকারী' এর সংজ্ঞা বিকৃত করেছে, তারা দ্রুত ঘটনাটিকে 'ইহুদী বিদ্বেষী হামলা' বলে চিহ্নিত করে এবং ঘটনাটিকে এর রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে পুরোপুরি আলাদা করে ফেলে।

ওয়াশিংটন পোস্ট

ওয়াশিংটন পোস্ট এই ঘটনাকে পশ্চিমে ইহুদী নিরাপত্তার জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তারা ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছে সেই গভীর ক্ষোভের মূল কারণ—যা দিনের পর দিন সঞ্চিত হয়ে উঠেছে এক ধ্বংসাত্মক যন্ত্রের বিরুদ্ধে, যার অর্থায়ন স্বয়ং ওয়াশিংটনই করে আসছে।

নিউ ইয়র্ক পোস্ট

নিউ ইয়র্ক পোস্ট এক নিবন্ধে শোকপ্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল: 'মাইকেল রাপাপোর্ট ইহুদীদের সতর্ক করছেন: 'বাঁচাতে কেউ আসবে না'। সেখানে তারা ইহুদী সম্প্রদায়কে 'ইহুদী বিদ্বেষী হামলার' আশঙ্কা থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়। কিন্তু তারা পুরোপুরি উপেক্ষা করে যায় যে, হামলার শিকার ব্যক্তিরা এমন একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছিল—যে রাষ্ট্র দখল, বসতি নির্মাণ, অনাহার আর অবরোধ চাপিয়ে দিয়েছে একটি মুসলিম জাতির উপর।

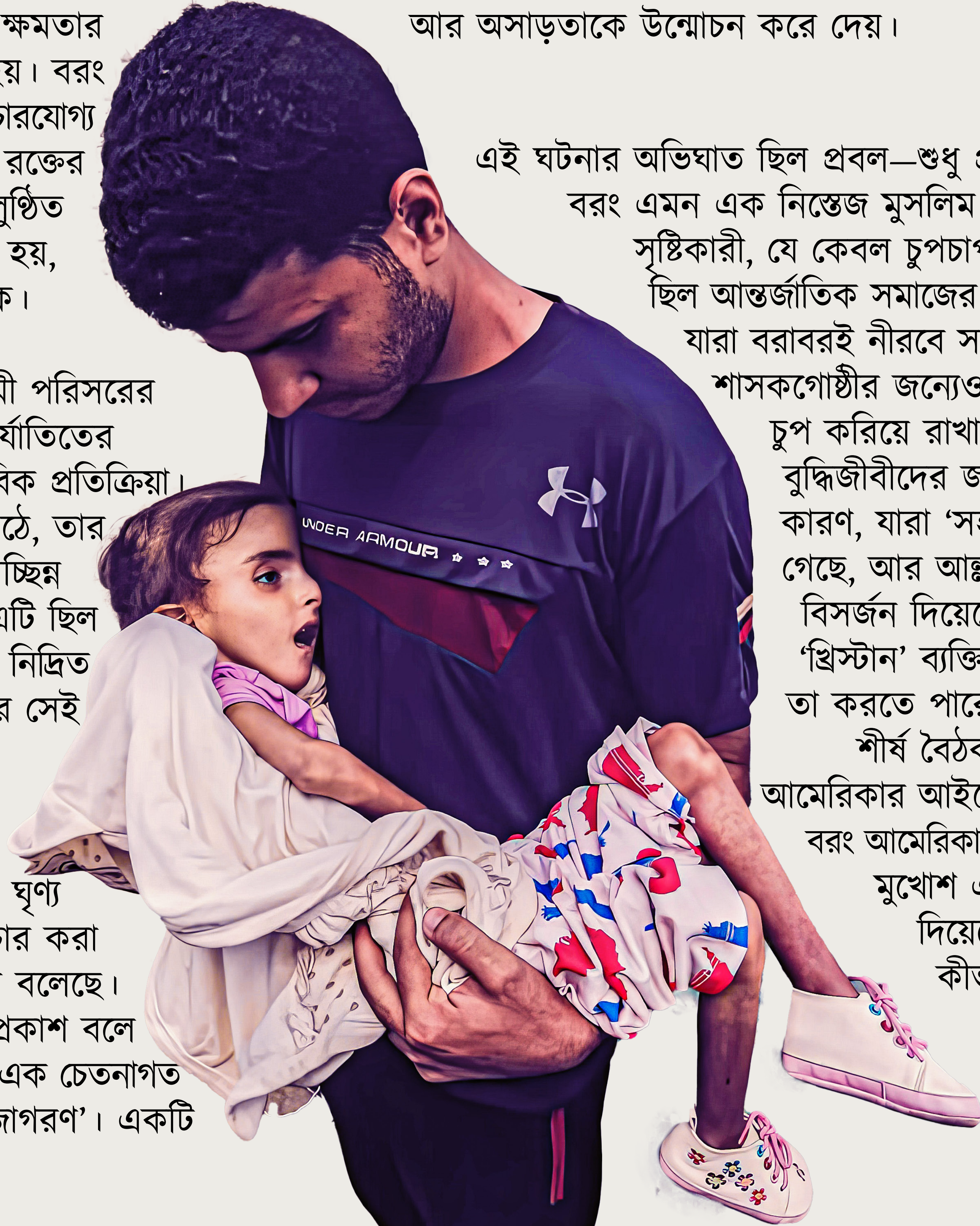
দ্য গার্ডিয়ান

সবচেয়ে অদ্ভুত ছিল দ্য গার্ডিয়ান-এর অবস্থান। তারা স্বভাববিরুদ্ধভাবে খানিকটা সংযত মনোভাব দেখায়। যদিও তারা একেবারে নির্দোষ বলেও ঘোষণা করেনি, তবে অন্তত 'ইলিয়াস রদ্রিগেজকে' স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'ইসলামীসন্ত্রাসী' তকমাদেয়নি। মনে হচ্ছিল তারা ইচ্ছা করলেই এই শ্রেণিকরণে তাকে ফেলত, কিন্তুদুর্ভাগ্যবশত, হামলাকারী ছিল না আমাদের ধর্মের বা গোষ্ঠীর কেউ।

তবে 'ইলিয়াস' যা করেছেন, তা পশ্চিমা মিডিয়ার স্কেলে পরিমাপযোগ্য নয়। এ কাজকে সেই রাজনৈতিক সংজ্ঞার আওতায় ফেলা যায় না—যেখানে সব কিছু ক্ষমতার স্বার্থ আর আধিপত্যের ফ্রেমে বিচার করা হয়। বরং এটি এমন এক উচ্চতর নৈতিক মানদণ্ডে বিচারযোগ্য যেখানে নির্যাতিতের পাশে দাঁড়ানো, নিষ্পাপ রক্তের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং প্রকাশ্যে ভূলুণ্ঠিত সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষায় প্রতিবাদ জানানো হয়, যখন সমগ্র দুনিয়া চুপ করে তাকিয়ে থাকে।

'ইলিয়াস'-এর এই পদক্ষেপ, যদিও ইসলামী পরিসরের বাইরের কেউ করেছিলেন, আসলে ছিল নির্যাতিতের আর্তনাদে সাড়া দেওয়া এক স্বতঃস্ফূর্ত মানবিক প্রতিক্রিয়া। গাজার চাপা কান্না শুনে যে অন্তর কেঁপে ওঠে, তার প্রতিফলন। তাই একে নিছক 'একক ও বিচ্ছিন্ন হামলা' বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। বরং এটি ছিল প্রথার বাইরে থেকে ওঠা এক আওয়াজ—যা নিদ্রিত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে এবং স্পর্শ করে সেই মানবিক আবেদনকে, যেটা মানুষ হিসেবে আমাদের সহজাত।

তাই 'ইলিয়াস'-এর কাজকে কেবল 'একটি ঘৃণ্য ঘৃণাজনিত অপরাধ' বলে সাদা-কালোয় বিচার করা যায় না, যেমনটি কট্টর ইহুদী-সমর্থক ট্রাম্প বলেছে। এটিকে কোনো তাৎক্ষণিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলেও খাটো করা যায় না। বরং এটি ছিল এমন এক চেতনাগত বিস্ফোরণ, যাকে বলা যায় 'প্রথার বাইরে জাগরণ'। একটি নৈতিক অবস্থান, যা প্রচলিত সাংস্কৃতিক কাঠামোর বাইরে থেকেও প্রকাশিত হয়, আর সেই কাঠামোর ভেতরে জমে থাকা নির্লিপ্ততা আর অসাড়তাকে উন্মোচন করে দেয়।



এই ঘটনার অভিঘাত ছিল প্রবল—শুধু প্রাতিষ্ঠানিক মহলে নয়, বরং এমন এক নিস্তেজ মুসলিম আত্মার উপরও প্রভাব সৃষ্টিকারী, যে কেবল চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। এটি ছিল আন্তর্জাতিক সমাজের ওপর এক চপেটাঘাত, যারা বরাবরই নীরবে সম্মতি দিয়ে যায়। আরব শাসকগোষ্ঠীর জন্যেও চপেটাঘাত, যাদেরকে চুপ করিয়ে রাখা হয়েছে। সেই মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের জন্যেও এ ঘটনা লজ্জার কারণ, যারা 'সহযোগিতার' মানে ভুলে গেছে, আর আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামকে বিসর্জন দিয়েছে। এক মুহূর্তেই, এক 'খ্রিস্টান' ব্যক্তি 'ইলিয়াস' যা করেছে, তা করতে পারেনি শত শত সম্মেলন, শীর্ষ বৈঠক বা বিক্ষোভ। সে শুধু আমেরিকার আইনের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায়নি, বরং আমেরিকার তথাকথিত নৈতিকতার মুখোশ একেবারে প্রকাশ্যে খুলে দিয়েছে। আর তুলে ধরেছে, কীভাবে তারা খোলা হাতে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে ইহুদী হত্যাযন্ত্রকে।

তার এই পদক্ষেপ এতটাই যুক্তিগ্রাহ্য, যা অনেক কুরআনের বাহককেই লজ্জায় ফেলে দেয়; যারা এখন আর উম্মাহর যন্ত্রণাকে নিজেদের অন্তরে অনুভব করে না, যাদের সামনে নির্যাতিত নারীদের কান্না যেন কিছুই না। এই মানুষটি—যদিও ইসলামের বাইরে, অবিশ্বাসী হিসেবেই—এমন এক কাজ করে ফেলেছে, যেটা আজ অনেক 'মুসলিম' করতেও সাহস পায় না, যদিও তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়েছে, তারা জ্ঞান অর্জন করেছে, সত্য জেনেছে। কিন্তু আজ তারা সেই কাজ থেকে সরে এসেছে। সে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, যেখানে বহু লোক শুধু স্লোগান দিয়েই ক্ষান্ত হয়।

এখানেই আসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক বৈপরীত্য:

যে সাহস জন্ম নিচ্ছে প্রবাসে, অবিশ্বাসীর অন্তরে। যে রাগ, যে ক্রোধ—তা খাঁটি মানবিক, তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন স্পষ্ট উচ্চারণ, যা কোনো ধূসর এলাকায় আশ্রয় নেয় না। সে প্রশ্ন করে না—কে জাতিতে মুসলিম, কে না; তার কাছে শুধু 'কে মজলুম, কে জালিম' এই সত্যটা জরুরি।

ইলিয়াসের এই কাজ কোনো ধর্মীয় আদর্শ থেকে আসেনি, বরং একেবারে নিখাদ মানবিক উপলব্ধি থেকে। আর এটাই আসলে অস্বস্তিকর। বিশেষ করে সেই ইসলামী কাঠামোর জন্য, যাদের আসলে সবচেয়ে আগে সাড়া দেওয়া উচিত ছিল ফিলিস্তিনের নির্যাতিতদের জন্য। প্রশ্নটা তাই আরও গভীর: কীভাবে এই রূহ বা চেতনা হারিয়ে গেল মুসলিমদের বিশাল এক অংশ থেকে, বিশেষ করে আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিমদের মাঝে থেকে? কোথায় ভুল করেছে আমাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো? কোথায় ব্যর্থ হয়েছে সেই জনমানস-ভিত্তিক ইসলামী বক্তৃতাগুলো—যেগুলো 'জিহাদি দায়িত্ব'-এর চেতনাকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে?



এটি একটি নৈতিক ও ধর্মীয় সংকট, রাজনৈতিক সংকট নয়।

এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, সমস্যা শুধু শক্তির ভারসাম্যে নয়, আর না অস্ত্রের দাপটে—বরং মূল সংকট হলো মুসলিম উম্মাহর নৈতিক ও ধর্মীয় চেতনার ভঙ্গুরতায়। আজ মুসলমানরা তাদের দায়িত্বকে কেবল বিবৃতি আর বিক্ষোভের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে। অথচ কাজটা করে যাচ্ছে 'অন্যরা'—হোক সে কোনো পশ্চিমা নাগরিক সমাজ, কিংবা ল্যাটিনো কোনো মানবাধিকার কর্মী। অথচ আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ৭০টিরও বেশি আয়াতে সরাসরি যুদ্ধ ও জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন,

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন, যা তোমাদের জীবন দান করে—তখন তোমরা সাড়া দাও"।

(সূরা আল-আনফাল ৮:২৪)

এই জায়গায় এসে একটা গভীর অস্তিত্বমূলক প্রশ্ন উঠে আসে: আজ কি মুসলিম উম্মাহ কেবল 'নৈতিক প্রতীক' ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে—সেগুলো তারা নিজেরা সৃষ্টি না করে?

আর জিহাদ—বিশেষ করে এর সামরিক অর্থ—তা কি শুধু এক প্রকার ইবাদতে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে, বাস্তব রাজনৈতিক ও প্রতিরোধমূলক ভাষা থেকে সরে গিয়ে?

পশ্চিমা বিবেক আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা কী হারিয়েছি।

এই পুরো দৃশ্যপট আসলে আমাদের জন্য এক আয়নার মতো।

মুসলমানরা—যারা ধর্মীয় মর্মবাণীর চাবিকাঠি ধরে রেখেছে, আর তাদের ভৌগোলিক পরিচয় এক বিশাল জগৎ জুড়ে বিস্তৃত—তারা আজ নিজেদের ঈমানকে কোনো অবস্থানে রূপ দিতে পারছে না। তারা পারছে না সরাসরি জিহাদি পদক্ষেপ নিতে, যেটা আল্লাহ তাঁদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, একজন অমুসলিম, যার ইসলামী বিশ্বাসের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, সে নিজের জীবন ও ভবিষ্যৎ উৎসর্গ করে সামনে এগিয়ে আসে। সে মুসলিম সম্প্রদায়কে চরমভাবে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়, বিশেষ করে আমেরিকার মুসলিমদেরকে।

আর বলে দেয়, জাগ্রত বিবেক কোনো জাতিগত বা ধর্মীয় সীমারেখা মানে না।

এই ঘটনাটির তাৎপর্য শুধু গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এক গভীর বার্তা—একজন অমুসলিম, যার সঙ্গে ফিলিস্তিনের ধর্ম বা জাতির কোনো সম্পর্ক নেই, সে নিজেই অস্ত্র তুলে নেয় ইহুদী দখলদার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে—তাও বিশ্বের রাজনৈতিক রাজধানী ওয়াশিংটনের ঠিক প্রাণকেন্দ্রে।

এটি নিছক আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রশ্ন নয়, বরং এটি মুসলিম মনোভূমির গভীরতর এক কাঁপুনি।

ইলিয়াস যা করেছিল—তা শুধু বাহবা নয়, আত্মসমালোচনার দৃষ্টি দিয়েই দেখা উচিত। একজন অমুসলিম, যিনি মুসলিম জাতির অন্তর্ভুক্ত নন-



তিনি যখন গাজা শহরের শিশুদের উপর বোমাবর্ষণ দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন—তখন সেটা প্রতিটি মুসলমানের জন্য হয়ে দাঁড়ায় এক আয়না। এই আয়নায় প্রতিফলিত হয় আমাদের নিজেদের বিবেকের অবক্ষয়, আর প্রশ্ন জেগে ওঠে: "কেন আমার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে? কেন আমার কাজ নেই?" আমি তো একজন মুসলমান, যার উপর ফরয করা হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, দুর্বল মুসলিম ভাইদের সাহায্য করা—নিজের প্রাণ, নিজের জবান ও নিজের সম্পদ দিয়ে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে:

মার্কিন মুসলমানদের আর কখন হবে ফুঁসে ওঠার সময়?

মুসলিম জনমানসে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া ছিল বৈচিত্র্যময়। কেউ এটিকে 'একক, বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে এড়িয়ে গেছেন, আবার কেউ এটিকে বলেছেন: 'ঘুমন্ত মুসলিম উম্মাহর গালে এক কঠিন নৈতিক চপেটাঘাত'।



তবে সবচেয়ে অস্বস্তিকর চিত্র ছিল এই: একদিকে পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো—কলম্বিয়া থেকে শুরু করে টরন্টো পর্যন্ত ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদে গর্জে উঠছে, অন্যদিকে, বহু আরব রাজধানীতে এমনকি ফিলিস্তিনি পতাকা উত্তোলনও নিষিদ্ধ। **তাহলে কোন দিকে যাচ্ছে আমাদের এই পথচলা?**

নিশ্চয়ই ঘটনাটি ভয়াবহ, কিন্তু এটি গুলির চেয়েও গভীর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে:

মুসলমানেরা কি এখন আগ্রহ বা উদ্যোগের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে? গণহত্যার প্রতি ক্ষোভ কি এখন 'আউটসোর্সড' হয়ে গেছে পশ্চিমা বিবেকের হাতে? মুসলিম বিশ্বের মধ্যে কি প্রতিবাদের আগুন নিভে যাচ্ছে, নাকি সদিচ্ছার ভাষা নিস্তব্ধ হয়ে পড়ছে? এই হতাশ চিত্র ভেঙে দেয় আমাদের আত্মঅহংকার।আসলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি এই নয়—ইলিয়াস রদ্রিগেজ কতগুলি গুলি ছুড়েছেন,

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো: "এই ঘটনাটি কতটি ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তুলেছে?" আমরা কি সবসময় চাই, বাইরের কেউ এসে আমাদের জাগিয়ে তুলবে? নাকি আসল সত্যি হলো: "সবকিছু ধসে পড়ার পর, বীরত্বই হয় মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল।" আজ কি আমাদের সাহস শিখতে হচ্ছে একজন লাতিন খ্রিস্টান থেকে?

হে মুসলিম উম্মাহ, এখনো কি সময় হয়নি? হে মুসলমান ভাই, একবার দাঁড়ান আয়নার সামনে, নিজের হৃদয়ের সঙ্গে করুন এক সৎ সংলাপ। নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, কোন খাদের কিনারায় এসে ঠেকেছে আমাদের উম্মাহ? আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি: একজন লাতিন খ্রিস্টান যুবক —যিনি কিবলার দিকও জানেন না, যাঁর মুখে কখনো সূরা ফাতিহা শোনা যায়নি—তিনি আজ গাজার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন প্রতিরোধের অগ্রভাগে, আর আমরাই—যারা কিবলার মানুষ, কুরআনের উত্তরাধিকারী—আজ দুর্বল, নিস্তেজ, বীরত্ব শূন্য?

হে মুসলিম উম্মাহ, এটা কি অপমানের ঘুম? নাকি অন্তর্জাগরণের সূচনা?

সারা পৃথিবীতে গুঞ্জন তুলে দিয়েছে এই সংবাদ: একজন লাতিন খ্রিস্টান যুবক, চিৎকার করে বলছে **"ফিলিস্তিন মুক্ত হোক"**, তারপর বন্দুক তাক করে সেই সব রক্ত পিপাসুদের দিকে—যারা গাজার শিশুদের রক্ত ঝরায়। সে এগিয়ে যায়, অচেনা এক সাহসে। সে ভয় পায় না কারাগারকে, না অবহেলিত মৃত্যুকে।

কে আগুন জ্বালাল তার অন্তরে? সে তো আমাদের জাতি বা ধর্মের কেউ নয়!

তবু কীভাবে তার হৃদয় কাঁপল এমনভাবে যে, সে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিল, আর আমরা কেবল পর্দার পেছনে বসে দোয়া করে যাচ্ছি, নাকি নিঃশব্দে আত্মসমর্পণের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি? আমাদের হৃদয়ে কি নেই এক চিলতে ঈমান, যা আবার জাগিয়ে তুলবে সেই ভুলে যাওয়া জিহাদের ফরয? **আমাদের শিরায় কি আর নেই এক ফোঁটা মুক্ত চিত্ত রক্ত?**

হে হাস্যোজ্জ্বল যোদ্ধা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাহ—আপনারা কি জানেন, কোনটি সত্যিকারের লজ্জা?



লজ্জার বিষয় এই যে, ইতিহাসে লেখা থাকবে—একজন খ্রিস্টান ভিন্ন জাতিসত্তার হয়েও গাজার পাশে দাঁড়িয়েছিল, বিজয় অর্জন করেছিল, প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল, নিজের সবকিছু উৎসর্গ করেছিল। অথচ টাঙিয়ের-এর প্রান্ত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলমানের বিজয় কেবল কণ্ঠনালীতে আটকে ছিল, কিংবা সীমাবদ্ধ ছিল ‘এক্স’ ও ‘ফেসবুকের’ পোস্টেই!

আপনারা কি কেউই বিবেকবান নন?

আপনারা কি শোনেননি আপনাদের নবী ﷺ বলেছেন ‘যে ব্যক্তি মুসলিমদের ব্যাপারে মনোযোগী নয়, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়’?

তাহলে আমরা কে, যদি আমাদের হৃদয়ে মুসলিম উম্মাহর দুঃখ না জাগে? আমরা কেমন মুসলমান, যদি আল্লাহর দ্বীন বিজয়ের চেতনা আমাদের বুকে জাগ্রত না হয়?





আমরা কীভাবে নিজেদের মুসলমান বলি, যদি ফিলিস্তিনের শিশুদের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ আমাদেরকে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য না করে?

আমরা কেমন মুসলমান, যদি আমরা ক্ষোভে না ফেটে পড়ি, যদি ন্যূনতম প্রতিক্রিয়ায়ও—একটি সাধারণ ছুরি পর্যন্ত—আমরা তাদের গলায় না রেখে আসি, যারা আমেরিকাসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে ইহুদীদের সাহায্য করে?

হে মুসলিম উম্মাহ! আপনারা কি পড়েননি কুরআনের সেই আয়াত—অর্থ: "আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ও নির্যাতিতদের জন্য যুদ্ধ করো না"?

[সূরা আন-নিসা ৪: ৭৫]

আপনারা কি ভুলে গেছেন যে, জিহাদ শুরুই হয় তরবারি দিয়ে, কেবল অর্থ কিংবা বক্তব্য দিয়ে নয়? আপনারা কি বিস্মৃত হয়েছেন যে, জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া, আর তা পরিত্যাগ করা মানে আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও ধিক্কারের যোগ্য হওয়া?

হে উমর, সালাহউদ্দীন ও খালিদের বংশধরগণ!
হে হিত্তিন ও আইন জালুতের উত্তরসূরিরা!

আর কতকাল থাকবে এই ঘুম? আপনারা কি এখনও জাগবেন না, সেই বার্তার উচ্চতায় উঠবেন না, যা আপনারা বহন করছেন? আর কতকাল আপনারা কেবল অন্যদের বীরত্বগাথা শুনবেন? আপনারা নিজেরা কবে ইতিহাসে নিজেদের গৌরবগাথা লিখবেন?

হে মুসলমানগণ! একজন লাতিন খ্রিস্টান যা করেছে, তা যেন আপনাদের মুখে এক হয়—একটি চপেটাঘাত, যা আপনাদের ঘুমভাঙা জাগরণে রূপ নেবে। অন্য ধর্মাবলম্বী আমাদেরকে সাহস ও আত্মত্যাগের অর্থ শেখাবে, এতে কোনো লজ্জা নেই। লজ্জার বিষয় একটাই—আমরা যদি তা থেকে কিছুই না শিখি।

এ মুহূর্ত কাঁদার জন্য নয়, হা-হুতাশ করার জন্য নয়, আর নয় একে অন্যকে দোষারোপ করার; বরং এখন সময়—সরাসরি, নির্ভীক, অনমনীয় কর্মপরিকল্পনা দিয়ে একটি জাগ্রত প্রতিক্রিয়া গড়ে তোলার।

আমরা, তানযিম কায়িদাতুল জিহাদ ফি জাজিরাতিল আরব **(আল কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা)** —এর দায়িত্ব হলো—অবিরাম এবং ক্লান্তিহীনভাবে দুটি দিক থেকে কাজ করে যাওয়া:

প্রথমত:

এমন কিছু প্রস্তুতি ও কার্যক্রম নেওয়া, যা প্রচলিত সীমারেখা অতিক্রম করে পশ্চিমা দুনিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে গর্জে ওঠে, বিশেষ করে সেই সব শক্তির বিরুদ্ধে যারা প্রকাশ্যে ইহুদী রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষক।



দ্বিতীয়ত:

বৈশ্বিকভাবে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করা, তাদের হাতে তুলে দেওয়া কার্যকর দিকনির্দেশনা ও উন্মুক্ত উৎসভিত্তিক কৌশল (যেমন 'ইনস্পায়ার' প্রকল্পের মাধ্যমে), যাতে তারা নিজ নিজ জায়গা থেকে আমেরিকা ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। সেই কাঠামোর বিরুদ্ধে, যারা ইহুদী রাষ্ট্রকে আর্থিকসহ সার্বিক সমর্থন দিয়ে চলছে।

পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসকারী বিশেষত আমেরিকার মুসলমানদের উচিত, আমাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া, **আল্লাহর পথে সংগ্রামে অংশ নেওয়া এবং গাজার মুসলিম ভাইদের সাহায্যের জন্য তথাকথিত 'রেড লাইন'-এর ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করা। আর তাদের উচিত এই অবিচারমূলক পশ্চিমা আইনের কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসা।**

অতএব এখন সময় ধর্মীয় ও শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন করে হিসাব কষার। নতুন প্রজন্মের অন্তরে **জিহাদ ও সাহায্য-সহযোগিতার** চেতনা শুধু নসীহত বা ওয়াজ নয়, বরং একটি বাস্তবিক দায়িত্ব হিসেবে গেঁথে দেওয়ার। বিশেষ করে আমেরিকার মুসলিমদের মধ্যে এই বিষয়টি একটি বাস্তব কর্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত জরুরি।

সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী বসবাসকারী মুসলিম উম্মাহর সবাইকে বুঝতে হবে যে, ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি কেবল একটি মৌসুমী অনলাইন ট্রেন্ড নয়। এটি প্রতিদিনের এক ধর্মীয় দায়িত্ব, এক অবিচ্ছেদ্য জিহাদি কর্তব্য।

সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী বসবাসকারী মুসলিম উম্মাহর সবাইকে বুঝতে হবে যে, ফিলিস্তিনের সঙ্গে সংহতি কেবল একটি মৌসুমী অনলাইন ট্রেন্ড নয়। এটি প্রতিদিনের এক ধর্মীয় দায়িত্ব, এক অবিচ্ছেদ্য জিহাদি কর্তব্য।

আর উম্মাহকে এটাও বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। আর কোনো কাজ, তা যত ছোটই হোক, যদি তা অন্তর থেকে হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিতে পারে।

সুতরাং এই মুহূর্তে প্রয়োজন ন্যায়ভিত্তিক ইসলামী আইন বাস্তবায়নের সাহসিকতা; অস্ত্রের শক্তিতে হলেও।

ওয়াশিংটনে এমন এক দরজা খুলে গেছে, যা বহু বছর মুসলমানরা আর স্পর্শ করেনি—এটি জিহাদ ও নির্মোহ ক্রোধের দরজা, যেখানে হিসাব-নিকাশ নেই, দ্বিধা নেই।



এই ঘটনাটি হোক আত্মসমালোচনার এক সুযোগ। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন—**“আমি একজন মুসলমান হিসেবে আরও বেশি কিছু কেন করতে পারি না? কেন আমি ‘ইলিয়াস’-এর চেয়েও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আত্মত্যাগের কাফেলায় যুক্ত হবো না?”**

আজ আপনার কাছে কেবল এতটুকু চাওয়া হচ্ছে না যে, আপনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন; কেবল এটুকুই নয় যে, আপনি আপনার সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দেবেন; কিংবা শুধু এটাও নয় যে, আপনি আপনার কণ্ঠ, কলম, সম্পদ ও চরিত্রকে সত্য-মিথ্যার এই যুদ্ধের জন্য কাজে লাগাবেন। আজ আপনার কাছে যা চাওয়া হচ্ছে, তা আরও গভীর। আপনার কাছে চাওয়া হচ্ছে ত্যাগ—আক্ষরিক অর্থে আল্লাহর পথে সংগ্রাম ও আত্মনিবেদন। হয়তো সেই দিন খুব কাছেই, যেদিন আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্টির দৃষ্টি দেবেন—যখন আমরা এই আয়াত শুনে শুধু আফসোস করব না, বরং জবাব দেবো কাজ দিয়ে:

অর্থ: “আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো না”?

(সূরা আন-নিসা ৪:৭৫)

হে আল্লাহ! আপনি তো জানেন—আমাদের হৃদয় ফিলিস্তিনের ভাই-বোনদের সঙ্গে বাঁধা। আমাদের হাত, আমাদের কাজ, আমাদের নিয়ত—সবকিছুই তাদের সেবায় নিবেদিত করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি মুসলিমদের মধ্যে যে দুর্বলতা ও অপমান ঘিরে রেখেছেন, তা দূর করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটাই আমরা চাই।

انهض بعزم لا يلين إذا

যখনই প্রয়োজন পড়ে, উঠে দাঁড়াও এক অটল সংকল্প নিয়ে,

ناداك حق واستثار الأذى

যদি সত্য তোমাকে ডাকে এবং কষ্ট উত্তেজিত করে,

وارفع لواء العدل في أُمَةٍ

একটি জাতির মাঝে ন্যায়ের পতাকা উঁচিয়ে ধরো,

قد مزق الباطل فيها الرجى

যেখানে মিথ্যা আশা-ভরসাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

قبضتك وعد لا يُبدّده

তোমার মুঠি এক অঙ্গীকার, যা নষ্ট করতে পারে না কেউ,

خصم، ولا يُطفئه من غوى

না শত্রু, না পথভ্রষ্ট কোনো ব্যক্তি তা নিভিয়ে দিতে পারে।

ونحنُ نُعِدُ الردّ في صمتِنا

আমরা আমাদের নীরবতার মধ্যেই প্রস্তুত করছি জবাব

ضربًا يُعيدُ الموكب الأولا

একটি আঘাত, যা প্রথম কাফেলাকে আবার ফিরিয়ে আনবে।



লোন জিহাদ গাইড টিম:

মে, ২০২৫ ইংরেজি | যুলকাদাহ, ১৪৪৬ হিজরি

আমরা ইনশাআল্লাহ মুসলিম মুজাহিদ বীর মুহাম্মাদ সাবরী সুলায়মান -এর অভিযানের ওপর একটি মন্তব্য প্রকাশ করব।

আগামী দিনের মুজাহিদের অপেক্ষায়

OSJ

ওপেন সোর্স জিহাদ

মুসলমানদের ক্ষমতায়নের জন্য



AL-MALAHEM MEDIA | النصر AN-NASR

হে আকসা! আমরা আসছি...